Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture’s
Volume-2, Issue-iv, published on October 2022, Page No. 203–208
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

শাহাদুজ্জামান রচিত ‘একজন কমলালেবু’ : একটি পাঠ প্রতিক্রিয়া

আদেশ লেট
গবেষক, বাংলা বিভাগ
কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেল : adesh.vb2018@gmail.com

Keyword
জীবনানন্দের জীবনী, শাহাদুজ্জামান, একজন কমলালেবু, কবি জীবনানন্দ, ঔপন্যাসিক জীবনানন্দ, সংসারী জীবনানন্দ; জীবনানন্দের প্রেমিকসত্তা, দুই বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব।

Abstract
বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক শাহাদুজ্জামান জীবনানন্দ দাশের সামগ্রিক সত্তা উদ্‌ঘাটনের উদ্দেশ্যে ‘একজন কমলালেবু’ উপন্যাস সৃষ্টি করতে ব্রতী হয়েছেন। তাঁর রচিত এই উপন্যাসে আমরা পাই জীবনানন্দের ব্যক্তিজীবন ও সাহিত্যিক-জীবনকে। কমলালেবুর খোসা ছাড়ালে আমরা যে একাধিক ‘কোয়া’ পেয়ে থাকি, সেগুলির মধ্যেও দেখতে পাই টক-মিষ্টি রসে টইটম্বুর অজস্র উপাদান। উপন্যাসেও ঠিক সেই রকমভাবে জীবনানন্দের বাইরের আবরণকে শিল্পসম্মতভাবে সরিয়ে রেখে, তাঁর জীবনের ভালো-মন্দ মিশ্রিত বিভিন্ন সত্তার উন্মোচন ঘটিয়েছেন ঔপন্যাসিক। ব্যক্তি-জীবনানন্দে আমরা পেয়েছি বাল্য-কৈশোরের নিঃসঙ্গতা, যৌবনে প্রেয়সীর প্রত্যাখ্যান, সুদূরপ্রসারী বেকারত্ব, সংসারী জীবনানন্দ ও অ-সুখী দাম্পত্যের পরিচয়। অন্যদিকে পাই সমালোনার জালে জর্জরিত এক আধুনিক কবি ও সাহিত্যিককে। জীবনানন্দ একজন উচ্চশিক্ষিত যুবক হয়েও তৎকালীন বিশ্বপরিস্থিতির কবলে পড়ে পেশাগতভাবে সঠিক মর্যাদা পাননি। বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, কর্মী ছাঁটাই প্রভৃতির ফলে দেশজুড়ে দেখা দিয়েছিল বেকারত্বের হাহাকার। স্বয়ং জীবনানন্দও হয়েছিলেন সেই বেকারত্বের শিকার। যার ফলস্বরূপ তাঁর জীবনে জন্ম নিয়েছিল নানান অস্থিরতা। ঔপন্যাসিক গতানুগতিক উপন্যাস রচনার ধারা থেকে সরে এসে যেভাবে জীবনানন্দের এলোমেলো জীবনপ্রণালীকে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন তা আমরা মূল প্রবন্ধের পর্যালোচনায় দেখে নেব।

Discussion
বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক শাহাদুজ্জামান রচিত ‘একজন কমলালেবু’ মূলত কবি জীবনানন্দ দাশের জীবনীমূলক উপন্যাস। জীবনানন্দ তাঁর সাহিত্যকীর্তি দিয়ে যেমন বাংলা সাহিত্যকে নতুন মাত্রা দিয়েছেন, নানা মাত্রায় রঞ্জিত তাঁর ব্যক্তিজীবনও তেমন সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছে ঔপন্যাসিকের কলমে। কীভাবে, তা আমরা দেখে নেব উপন্যাসের পর্যালোচনায়। এখন পাঠক হিসেবে আমরা প্রথমেই যে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে পারি তা হল, উপন্যাসের নাম ‘একজন কমলালেবু’ কেন? আলোচনার পূর্বে আমরা এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা করবো।

জীবনানন্দের বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'বনলতা সেন'-এর অন্তর্গত 'কমলালেবু' শিরোনামে একটি কবিতা রয়েছে। কবিতাটি এরকম—

> "একবার যখন দেহ থেকে বার হয়ে যাব
> আবার কি ফিরে আসব না আমি পৃথিবীতে?
> আবার যেন ফিরে আসি
> কোনো এক শীতের রাতে
> একটা হিম কমলালেবুর করুণ মাংস নিয়ে
> কোনো এক পরিচিত মুমূর্ষের বিছানার কিনারে।"[১]

ঔপন্যাসিক উপন্যাসের শেষ অধ্যায়ে উক্ত কবিতাটির উল্লেখ করেছেন। কবিতাটি পড়ে আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে, এখানে কবির মৃত্যুচেতনা স্পষ্ট। আবার আমরা এও দেখেছি যে জীবনানন্দ জীবনের শেষ মুহূর্তে তাঁর সুহৃদ সঞ্জয় ভট্টাচার্যের কাছে একটি কমলালেবু খেতে চেয়েছিলেন। তাই আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে জীবনের চরম পরিণতি মৃত্যুকে নির্দেশ করতেই মৃত্যুচেতনামূলক এই কবিতাটির শিরোনামকেই বেছে নিয়েছেন ঔপন্যাসিক। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে, কবিতার শিরোনাম 'কমলালেবু'। এই হিসেবে উপন্যাসের নামও 'কমলালেবু' হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তা না হয়ে 'একজন কমলালেবু' হল কেন? 'একজন কমলালেবু' এখানে ব্যক্তি নির্দেশক। তাই আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না, এই ব্যক্তি বা 'কমলালেবু' হলেন জীবনানন্দ। একটি কমলালেবুকে বাইরে থেকে দেখলে তার স্বাদ, গন্ধ অথবা ভিতরে কি আছে সে সম্পর্কে ধারণা করা যায় না। তার খোসা বা খোলস ছাড়ালে আমরা দেখতে পাই একাধিক 'কোয়া', যেগুলি একে অপরের সঙ্গে আষ্টেপিষ্টে লেগে থাকলেও প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র। আবার সেগুলিকে ভাঙলেও প্রচুর ছোটো ছোটো উপাদান পাওয়া যাবে যা টক-মিষ্টি রস দ্বারা পরিপূর্ণ। অর্থাৎ কমলালেবু তার সবকিছুই নিজের মধ্যে লুকিয়ে রাখে। 'কবি-জীবনানন্দ' হলেন সেই 'কমলালেবু' যাঁকে আমরা বাইরে থেকে চিনি। তিনি একটি আবরণের মধ্যে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিলেন। তিনি তাঁর ব্যক্তিজীবনের প্রেম, বেকারত্বের যন্ত্রণা, অ-সুখী দাম্পত্য সবকিছুই প্রকাশ করেছেন তাঁর সৃষ্ট উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিতে ও ডায়রির পাতায়। সেইসব পাণ্ডুলিপির কোনোটাই তিনি পাঠকের সামনে আনেননি, সযত্নে বাক্সবন্দী করে রেখেছিলেন তাঁর অস্থায়ী বাসস্থান ; কলকাতার ১৮৩ ল্যান্সডাউন রোডের ছোটো ঘরটিতে। শাহাদুজ্জামান তাঁর উপন্যাসে সেই আবরণের উন্মোচন ঘটিয়ে জীবনানন্দের সমগ্র দিককে ভেঙে ভেঙে পাঠকের সামনে তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়েছেন। যেখানে ধরা পড়েছে জীবনানন্দের একাধিক সত্তা, যা কমলালেবুর ন্যায় 'টক-মিষ্টি' রস সূচিত ভালো-মন্দ, সুখ-দুঃখ সবকিছুর দ্বারা ভরপুর। বলা যেতে পারে, এই ব্যঞ্জনা সৃষ্টির জন্যই তিনি সরাসরি নাম না দিয়ে উপন্যাসের নামকরণ করেছেন 'একজন কমলালেবু'।

গতানুগতিক উপন্যাস রচনার ধারা থেকে সরে এসে আলোচ্য উপন্যাসটিকে নতুনভাবে পরিবেশন করেছেন ঔপন্যাসিক। তিনি উপন্যাসটিকে ৪৮টি অধ্যায়ে বিভাজন ও সেগুলিকে ছোটো ছোটো পর্বে ভাগ করেছেন। ঠিক যেন কমলালেবুর খোসা ছাড়ানোর পদ্ধতি অবলম্বন করে তিনি জীবনানন্দের বিভিন্ন সত্তার উন্মোচন করেছেন। উপন্যাসে পরিলক্ষিত হয়েছে জীবনানন্দের দুটি দিক; সাহিত্যিক-জীবনানন্দ ও ব্যক্তি-জীবনানন্দ। সাহিত্যিক জীবনানন্দের মধ্যে যে সত্তাগুলি রয়েছে তা হল- কবি, ঔপন্যাসিক, গল্পকার, প্রাবন্ধিক। ব্যক্তিজীবনানন্দে আমরা পেয়েছি তাঁর বাল্য-কৈশোর, প্রেমিক, বেকার যুবক, সংসারী, দেশপ্রেমী ইত্যাদি সত্তাগুলি।

উপন্যাসটি শুরু হয়েছে একটি 'ফ্লাশব্যাক'(Flashback) দিয়ে—

> "পুরোনো শতাব্দীর ধুলোমাখা একটা সরীসৃপের মতো কলকাতার বালিগঞ্জ ডাউন ট্রাম ঘন ঘন ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে এগিয়ে আসছে রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ের দিকে। চারদিকে তখন শেষ বিকেলের রোদ। ট্রাম এগিয়ে আসছে, সেই লোকও এগিয়ে যাচ্ছেন ট্রাম লাইনের দিকে। ট্রামের ড্রাইভার জোরে জোরে ঘন্টা বাজালেন, চিৎকার করে ডাকলেন, তবু সে লোক উঠে গেলেন ট্রাম লাইনের ওপর এবং আটকে গেলেন ট্রামের ক্যাচারে।"[২]

অর্থাৎ আমরা প্রথমেই পাচ্ছি জীবনানন্দের মৃত্যুর ঘটনা। ট্রামের ক্যাচারে ঢুকে মৃত্যু, এ এক আশ্চর্য ঘটনা। তিনি হয়তো প্রথম ও শেষ ব্যক্তি যাঁর এমন ভাবে মৃত্যু হয়েছে। তাই ঔপন্যাসিক পাঠকের সামনে কয়েকটি প্রশ্নের উদ্রেক করেছেন—

"এটা কি একটা দুর্ঘটনা? নাকি তিনি ট্রামের চাকার নিচে আত্মহত্যা করেছেন? অথবা এটা কি আসলে একটা হত্যাকাণ্ড, যার পেছনে রয়েছে আরও অনেকের অদৃশ্য হাত?"[৩]

তারপর ধাপে ধাপে তাঁর জীবনের আনুপুঙ্খিক ঘটনা বর্ণনের দিকে এগিয়ে গেছেন। জীবনানন্দের জীবন সমাজের আর পাঁচজনের মতো সাধারণ বা স্বাভাবিক ছিল না। বিভিন্ন কারণে তিনি ব্যক্তিজীবনে যেমন নানান দোলাচলতার সম্মুখীন হয়েছেন, তেমন সাহিত্যক্ষেত্রেও দেখা যায় তিনি কাব্য রচনা করবেন নাকি গদ্য রচনা করবেন তা নিয়ে একাধিকবার দ্বিধান্বিত হয়ে পড়েছেন। তাঁর জীবনের এমন এলোমেলো ক্রমকে একাধিকবার 'ফ্যাশব্যাক' ও 'ফ্ল্যাশ-ফরওয়ার্ড' এর মাধ্যমে সুন্দরভাবে পাঠকের সামনে সাজিয়ে তুলেছেন ঔপন্যাসিক। পাঠক যাতে ঘটনার 'খেই' হারিয়ে না ফেলেন তার জন্য প্রত্যেকটি অধ্যায়ের সামঞ্জস্যপূর্ণ নামকরণও করেছেন তিনি। এখন আমরা দেখে নেব ঔপন্যাসিক কীভাবে জীবনানন্দের বিভিন্ন দিককে আমাদের সামনে উন্মোচিত করেছেন।

প্রথমেই আসা যাক সাহিত্যিক জীবনানন্দকে আমরা যেভাবে পেয়েছি সে পর্যালোচনায়। তিনি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আবিষ্কার করেছেন কবি জীবনানন্দ এবং কথাসাহিত্যিক জীবনানন্দকে। তিনি বিবৃতি দিয়েছেন—

"লক্ষ করা যায় তাঁর কবিতায় ব্যক্তি জীবনানন্দ তেমন উপস্থিত নন, তিনি আছেন পরোক্ষ অথচ গল্প-উপন্যাসে তিনি খুবই আত্মজৈবনিক।"[৪]

ছোটোবেলায় মায়ের হাত ধরে জীবনানন্দের কবিতা লেখা শুরু। তবে পরবর্তীকালে গতানুগতিক কবিতা লেখায় তিনি অনাগ্রহী ছিলেন। আসলে তিনি ছিলেন ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র। তিনি এড্‌গার-এলান-পো, টমাস হার্ডি, জন কীট্‌স প্রমুখের মতো কবিদের কবিতা আস্বাদন করেছেন। তখন বিশ্বসাহিত্যকে প্রভাবিত করেছিল পাশ্চাত্য সাহিত্য আন্দোলন। এদিকে বাংলা সাহিত্যে একদল সাহিত্যিক রবীন্দ্র ভাবধারা থেকে মুক্ত হয়ে কবিতার এক নতুন রূপ খোঁজার চেষ্টা করেছেন। জীবনানন্দ ছিলেন তাঁর সমকালের চেয়ে অনেকটা এগিয়ে। তিনি রবীন্দ্র আগ্রহী বা বিরোধী কোনো দলেই না ভিঁড়ে নিজের সৃষ্ট এক নতুন পথকে বেছে নিয়েছিলেন। এর জন্য তিনি সমকালীন বিখ্যাত কবি সজনীকান্ত দাস, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখের দ্বারা নানাভাবে সমালোচিত হয়েছেন। 'ক্যাম্পে' কবিতার জন্য তাঁকে গ্রহণ করতে হয়েছে অশ্লীলতার দায়। এমনকি সমকালীন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মনও আকর্ষণ করতে পারেননি তিনি। তবুও একের পর এক কবিতা লিখে গেছেন। কবির পক্ষে ছিলেন অতিন্ত্য সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, সঞ্জয় ভট্টাচার্য প্রমুখ। তাঁরা জীবনানন্দের কবিতাকে প্রকৃতই বোঝার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁরা বিশ্বাসী হয়েছিলেন এই লেখার মাধ্যমেই আধুনিক বাংলা কাব্যসাহিত্যের মোড় ফিরবে। সঞ্জয় ভট্টাচার্য জীবনানন্দের কবিতায় সুররিয়ালিজ্‌মের আঁচ অনুভব করেছিলেন। ঔপন্যাসিক লিখেছেন—

"সঞ্জয় জীবনানন্দের এই কবিতাটার ভূয়সী প্রশংসা করলেন, লিখলেন, জীবনানন্দের 'ঘোড়া' কবিতাটা বাংলায় 'সুর রিয়ালিস্ট' কবিতার প্রথম সফল উদাহরণ।"[৫]

জীবনানন্দকে আমরা যখন কথাসাহিত্যিক হিসেবে পাচ্ছি তখন দেখছি, ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতা, যন্ত্রণা, ইচ্ছা সবকিছুই পরিস্ফুট হয়েছে তাঁর রচিত গল্প-উপন্যাসের চরিত্রদের মধ্য দিয়ে। তিনি কবিতা লিখে বিভিন্ন পত্রিকায় ছাপানোর জন্য অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু গল্প-উপন্যাস কোনোটাই তিনি জীবিতকালে প্রকাশ করেননি। পাণ্ডুলিপি আকারে সবটাই তিনি সযত্নে বাক্সবন্দী করে রেখেছিলেন। তাই ঔপন্যাসিক মনে করেন—

"হতে পারে তিনি তাঁর কবিতা নিয়ে যতটা আত্মবিশ্বাসী ছিলেন, কথাসাহিত্যের ব্যাপারে ততটা আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠতে পারেননি।"[৬]

উপন্যাসে যেভাবে প্রাবন্ধিক জীবনানন্দকে আমরা পেয়েছি তিনি আসলে একজন দার্শনিক। ব্যক্তিগত জীবন অর্থাৎ দাম্পত্য, প্রেম এই বিষয়গুলি থেকে উত্তীর্ণ হয়ে তিনি বিশ্বভাবনাকে তাঁর প্রবন্ধের বিষয় করেছেন। ১৯৩৮ সালে তিনি 'পৃথিবী ও সময়' প্রবন্ধে এই ভাবনাটি ব্যক্ত করেছেন। শুধু তা-ই নয়, 'আর্টের অত্যাচার' প্রবন্ধে শিল্প ও সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর যে নানান মৌলিক ধারণাগুলি রয়েছে উপন্যাস পড়ে সে সম্পর্কে পরিচয় পাওয়া যাবে।

উপন্যাসে ব্যক্তি-জীবনানন্দকে পেয়েছি বিভিন্ন ভূমিকায়। তিনি বাল্যজীবন থেকেই সমবয়সীদের সঙ্গে তেমনভাবে মেলামেশা করতে আগ্রহী ছিলেন না। এপ্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে—

"মিলুর অসমবয়সী বন্ধু আলী মামুদ। মিলুর বন্ধু রাজমিস্ত্রি মনিরুদ্দিনও।"[৭]

উপন্যাসের এই অংশ গুলি। তিনি নানা উপকথা ও গল্প শুনতেন মায়ের গৃহস্থালি কাজের সহযোগী 'মোতির মা'-এর কাছ থেকে। ঔপন্যাসিক লিখেছেন—

> "সন্ধ্যায় মিলুর সঙ্গী মোতির মা, কুসুমকুমারীর গৃহস্থালি কাজের সহযোগী। তিনি মিলুকে শোনান ডাইনি আর শঙ্খমালার গল্প।"[৮]

কাজেই স্পষ্ট হয়ে যায় যে তিনি জীবন-অভিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ মানুষদের প্রতি বেশি আগ্রহী ছিলেন।

যুবক জীবনানন্দ ছিলেন একজন প্রেমিক। সামাজিক রীতিনীতি বা চক্ষুলজ্জা প্রেমিক-জীবনানন্দকে কোনোভাবে বাধা দিতে পারেনি। কাজের খোঁজে জীবনানন্দ রওনা দিয়েছিলেন আসামে। সেখানে তাঁর অতুলানন্দ কাকার মেয়ে শোভনা দাশ-কে ঘিরে তৈরি হয় গভীর প্রেমাকর্ষণ। তিনি তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ঝরাপালক' উৎসর্গ করেছিলেন শোভনাকে। যদিও তিনি সরাসরি কোনো নাম উল্লেখ করেননি, উৎসর্গপত্রে শুধু লিখেছিলেন 'কল্যাণীয়াসুকে'। তবে এই 'কল্যাণীয়াসু' যে শোভনা তার প্রমাণ রয়েছে উপন্যাসে। বলা বাহুল্য এই উৎসর্গপত্রই ছিল শোভনার প্রতি তাঁর প্রেম-নিবেদন। অন্যান্য কাব্যগ্রন্থেও তিনি বিভিন্ন অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার পরিস্ফুটন ঘটিয়ে তাঁর প্রেমকে অমর করে তুলেছেন। 'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থটি প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য। আসলে জীবনানন্দ হলেন শিল্পী। তিনি সরাসরি কোথাও নিজের প্রেমকে ব্যক্ত করতে চাননি। কবিতায়, ডায়রিতে বিভিন্ন সাংকেতিক ভাষায় তা নিজের শৈল্পিক আবরণের মধ্যে আগলে রাখতে চেয়েছিলেন। ঔপন্যাসিক খুব সুন্দরভাবে জীবনানন্দের এই অপ্রকাশিত দিকটি তথ্যসমৃদ্ধভাবে পাঠকের সামনে এনেছেন।

এরপর জীবনানন্দ হয়ে উঠেছেন সংসারী। তিনি সাধারণ লোকের মতো চলতে অভ্যস্ত না হলেও গুরুজনদের অমান্য করে চলতেন না। তাই মা কুসুমকুমারী দাশের নির্দেশে ঢাকা ব্রাহ্মমন্দিরের আচার্য অমৃতলাল গুপ্তের ভাইয়ের মেয়ে লাবণ্য গুপ্তকে নিজের জীবনসঙ্গিনী করে নিয়েছিলেন। বিবাহ পরবর্তীকালে চাকরি চলে যাওয়ায় তিনি অতি গম্ভীর আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন। ফলস্বরূপ তাঁকে ভোগ করতে হয়েছে স্ত্রী লাবণ্যের অপ্রত্যাশিত কথার জ্বালা। একই পরিস্থিতিতে কাব্যচর্চা করে তিনি অপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন লাবণ্যের কাছে। জীবনানন্দ ছিলেন অত্যন্ত সহ্যশালী ব্যক্তিত্বের মানুষ। কলহের চাপে পাল্টা লাবণ্যের প্রতি তিনি কোনো প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন এমন পরিচয় পাওয়া যায় না। তৎকালীন সমাজের মানুষ হয়েও তিনি লাবণ্যের স্বাচ্ছন্দ্যে পূর্ণস্বাধীনতা দিয়েছিলেন। জীবনানন্দ সাংসারিক কলহের কথাও সরাসরি প্রকাশ করেননি। তাঁর গল্প-উপন্যাসের চরিত্র বিশ্লেষণ করে ঔপন্যাসিক তা আমাদের সামনে পরিস্ফুট করেছেন। বোঝা যায় লাবণ্যের সংসারে জীবনানন্দ তেমন সফল ছিলেন না। লাবণ্য দাশ 'মানুষ জীবনানন্দ' নামে একটি স্মৃতিকথামূলক গ্রন্থ রচনা করে সংসারে জীবনানন্দ কেমন ছিলেন তার পরিচয় দিয়েছেন। এখানে আমরা এক অন্য জীবনানন্দের পরিচয় পাই। এখানে তিনি সহজ-সরল ও হাসিখুশি মনের মানুষ এবং একজন প্রকৃত পিতা হিসেবে বর্ণিত হয়েছেন। একদিক থেকে তা সত্য। কারণ জীবনানন্দ বরাবরই নিজেকে গুটিয়ে রাখতেন, ভিতরের দগ্ধতা তিনি বাইরে প্রকাশ করতেন না। আবার এও হতে পারে লাবণ্য দাশ জীবনানন্দের ভিতরের সত্তাটিকে কোনোভাবে আমল দেন নি। ঔপন্যাসিক তাই মন্তব্য করেছেন—

> "তিনি চেয়েছিলেন একটা সচ্ছল সংসার, স্বামী হিসেবে চেয়েছেন একজন সাধারণ মানুষকে, যে স্ত্রীকে সময় দেবে, যার জীবন হবে সংসারকে কেন্দ্র করে। উনি এমন লোককে স্বামী হিসেবে চাননি, যার মাথার চারপাশে বোধ কাজ করে।"[৯]

কর্মজীবনেও তিনি একজন সফল শিক্ষক হয়ে উঠতে পারেননি। তিনি ছিলেন ছাত্রদরদী। তিনি মনের দিক থেকে আধুনিক হলেও বাহ্যিক ঐশ্বর্যে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন না। পরনে সাদামাটা ধুতি-পাঞ্জাবী ছিল তাঁর পোশাকি পরিচয়। আবার, তিনি 'মুখচোরা' প্রকৃতির হওয়ার কারণে ছাত্রদের সঙ্গে তেমন মানসিক যোগাযোগ করে উঠতে পারেননি। অন্যদিকে তিনি ভুগেছেন দীর্ঘ বেকারত্বের যন্ত্রণায়। জীবনানন্দ এক জীবনে দুই বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব পেয়েছিলেন। দেশজুড়ে চলছে আর্থিক সংকট, খাদ্যাভাব, কর্মী ছাঁটাই ইত্যাদি। তিনিও এই পরিস্থিতির শিকার হয়েছিলেন। তাই তিনি কি করবেন তা নিয়ে অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। শেষমেশ তিনি সাহিত্যরচনাকেই জীবনের সার করতে চেয়েছেন। তাঁর বিভিন্ন কবিতায় তাই বিশ্বভাবনার ছবিও ফুটে উঠেছে। তিনি লেখার জন্য চেয়েছেন নিরিবিলি এক উপযুক্ত পরিবেশ। তাই বারবার কলকাতা গমন করেছেন, মন না টিকলে আবার বরিশালের বাড়িতে ফিরে গেছেন। এমন পরিস্থিতিতে অসহ্য হয়ে তিনি তাঁর বিভিন্ন

উপন্যাসের চরিত্রের মধ্য দিয়ে আত্মহননের ইচ্ছাও প্রকাশ করেছেন। তবুও জীবনানন্দ থেমে থাকেননি, তিনি লিখে যেতে চেয়েছেন। ঔপন্যাসিক তাই লিখেছেন—

> "মৃত্যু এবং লেখার ভেতর লেখাকে বেছে নিলেন তিনি।"[১০]

এভাবে ঔপন্যাসিক তৎকালীন সময়কে খুব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছেন।

পরিশেষে বলা যায়, ঔপন্যাসিক জীবনানন্দের জীবনী অঙ্কন করতে গিয়ে শুধু তাঁর ভালো দিকগুলি তুলে ধরেছেন এমন নয়, যৌবনে পতিতালয়ে গমন ও হস্তমৈথুন করার মতো ঘটনাকেও তিনি নির্দ্বিধায় পাঠকের সামনে এনেছেন।

> "...ডায়েরির এই এন্ট্রিতে দেখা যাচ্ছে, সারা রাত বেশ কয়বার হস্তমৈথুন করেছেন তিনি। তাতে সকালে পিঠ ব্যথা করছে তাঁর। স্বমহনের যৌন আনন্দের ভেতর দিয়ে তিনি বুঝি নিজেকে ভারমুক্ত করতে চাচ্ছিলেন তখন।
>
> মানসিক টানাপোড়েনের এ রকম একটা অবস্থাতেই একদিন একটা বেমক্কা কাজ করলেন জীবনানন্দ, গেলেন দিল্লির বেশ্যালয়ে। রামযশ কলেজের তাঁর এক সহকর্মী নিয়ে গেলেন তাঁকে। ওই নিষিদ্ধ পল্লিতে যাওয়ার প্রথম অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন জীবনানন্দ ডায়রিতে, 'Girls here-first impression of brothels-women here: ideas about them: everything-নমস্তে।"[১১]

উপন্যাসের এই অংশটি তার প্রমাণ। উপন্যাসটি পড়ে সহজেই বুঝতে পারি জীবনানন্দ ছিলেন সরল ও সাদাসিধে প্রকৃতির। তবে এটাই তাঁর শেষ পরিচয় নয়। তিনি প্রতিবাদীও ছিলেন। তিনি তাঁর সমালোচকদের পত্র মাধ্যমে যথোপযুক্ত জবাব দিয়েছিলেন, সেই পরিচয়ও ঔপন্যাসিক দিয়েছেন। শুরুতে ঔপন্যাসিক পাঠকের সামনে যে প্রশ্নগুলি তুলে ধরেছেন সমাপ্তিতেও আবার সেই প্রশ্নগুলির পুনরাবৃত্তি করেছেন—

> "শূন্যে অবশ্য ভেসে রইল অমীমাংসিত সেই জিজ্ঞাসা, জীবনানন্দের এই মৃত্যু তাহলে কী —
>
> দুর্ঘটনা?
>
> আত্মহত্যা?
>
> হত্যাকাণ্ড?"[১২]

আসলে ঔপন্যাসিক নিজের মতো করে কোনো সিদ্ধান্তই পাঠকের ওপর চাপিয়ে দিতে চান নি। সত্যকে সামনে এনে পাঠককেই তা বিচার করার স্বাধীনতা দিয়েছেন। সজনীকান্ত দাস বরাবরই জীবনানন্দের কবিতার বিরূপ মন্তব্য করে এসেছেন। কিন্তু জীবনানন্দ যখন মৃত্যুশয্যায় তখন সজনীকান্ত খবর পেয়ে এসেছিলেন তাঁর উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য। বলেছিলেন—

> "আমি কি জানতাম না যে জীবনানন্দ বাবু কত বড় কবি, কত বড় মানুষ। নইলে শুধু তার কবিতা নিয়েই এত কথা বলার তো দরকার হতো না আমার।"[১৩]

জীবিতকালে কবি জীবনানন্দের এই প্রাপ্তি স্বীকার করতেও ভোলেননি ঔপন্যাসিক। অর্থাৎ তিনি অত্যন্ত নিরপেক্ষভাবে এই উপন্যাস সৃষ্টি করেছেন একথা নির্দ্বিধায় স্বীকার করা যায়।

পর্যালোচনার শেষে আরো কতগুলি কথা রয়েছে যা বলা আবশ্যক। ঔপন্যাসিক উপন্যাস পরিবেশন করতে গিয়ে হঠাৎ কমলালেবুর খোসা ছাড়ানোর পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন কেন? কেনই বা তিনি পাঠকের সামনে জীবনানন্দের মৃত্যু প্রসঙ্গে প্রশ্ন তুলেছেন? এই দিকগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক। 'কমলালেবু' যদি জীবনানন্দ হয়, তবে কমলালেবুর খোসা ছাড়ানোর পদ্ধতি যেন আমাদের কাছে জীবনানন্দের ময়নাতদন্তের মতো মনে হয়। ট্রামের গতি অন্যান্য গাড়ির তুলনায় শ্লথ। তাই রাস্তার ভিঁড় এড়ানোর জন্য অনবরত ঘন্টাধ্বনি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ট্রামে ক্যাচার থাকার কারণ চাকায় যাতে কোনো পশু অর্থাৎ রাস্তার কুকুর, ছাগল ইত্যাদি এসে ঢুকতে না পারে। একজন মানুষ কতখানি চিন্তামগ্ন থাকলে ট্রামের ঘন্টাধ্বনি শুনতে না পেয়ে ট্রামের ক্যাচারে ঢুকে যেতে পারেন এই বিষয়টি ঔপন্যাসিকের কাছে আশ্চর্যের বলে মনে হয়েছে। তবে কি বাস্তবিক তাঁর ময়নাতদন্ত করা হয়েছিল? তা নয়। ট্রামের ক্যাচারে ঢুকে বাইরে থেকে যে শারীরিক আঘাত তিনি পেয়েছিলেন তা নিয়ে ঔপন্যাসিক প্রশ্ন তোলেননি। তিনি কোন মানসিক চাপে পড়ে ট্রামের ঘণ্টাধ্বনি শুনতে পেলেন না— ঔপন্যাসিকের প্রশ্ন এখানে। আমরা জানি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে যে ময়নাতদন্ত হয় তাতে শারীরিক আঘাতের চিহ্ন এবং তার কারণ সম্পর্কে জানা যায় কিন্তু মানসিক আঘাতের বিষয়টি জানা সম্ভবপর নয়। ঔপন্যাসিক তাই

জীবনানন্দের বিভিন্ন সত্তাকে পাঠকের সামনে এনে তাঁর মানসিক চাপের জায়গাটি স্পষ্ট করে দিয়েছেন। কেন তাঁর মাথায় 'বোধ' কাজ করে সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছেন। তাই বলা যেতে পারে আলোচ্য উপন্যাসটি শুধু জীবনানন্দের জীবনীমূলক উপন্যাস নয়, তাঁর মানসিক ময়নাতদন্তের রিপোর্ট।

তথ্যসূত্র :

১. শাহাদুজ্জামান, 'একজন কমলালেবু', প্রথম প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন ১৪২৩, ফেব্রুয়ারি, ২০১৭, দ্বিতীয় সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জ্যৈষ্ঠ ১৪২৪, জুন ২০১৭, ৪১ তোপখানা, ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ, পৃ. ২৩৭
২. তদেব, পৃ. ৭
৩. তদেব, পৃ. ৯
৪. তদেব, পৃ. ২০৫
৫. তদেব, পৃ. ১৫১
৬. তদেব, পৃ. ২০৫
৭. তদেব, পৃ. ১৩
৮. তদেব, পৃ. ১৪
৯. তদেব, পৃ. ১৯৯
১০. তদেব, পৃ. ১৮৮
১১. তদেব, পৃ. ৬৩
১২. তদেব, পৃ. ২৩৮
১৩. তদেব, পৃ. ২৩৭

সহায়ক গ্রন্থ :

১. লাবণ্য দাশ, 'মানুষ জীবনানন্দ', ভাষাচিত্র, প্রথম প্রকাশ : ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৫, ৩৮ বাংলা বাজার রোড, ঢাকা, বাংলাদেশ